বহুধাখণ্ডিত বাঙালি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ড. সাজ্জাদ জহির |
ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক |

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
জানুয়ারি ০৪-০৫, ২০২০ |

গত এক মাসজুড়ে আঞ্চলিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ নতুন একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে, 'রাজামশাই ন্যাংটা কেন?' অদৃশ্য পোশাকে রাজার পথযাত্রার গল্পের সেই শিশুটির বিস্ময়োক্তি ঠিক একই ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা কেন অনেক ক্ষেত্রে, ধারাবাহিকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেন, তার কারণ বোঝা দুষ্কর। দর্শন ও অর্থনীতি মিশিয়ে আমার ধারণা, যা ঘটছে তার নিশ্চিত কোনো কারণ আছে এবং যে প্রত্যাশায় কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেন, তা নিশ্চয়ই মিথ্যা বলার নেতিবাচক দিক মিটিয়ে মিথ্যাচারীর জন্য অধিক লাভ আনে। রাজনীতির অঙ্গনে চলমান মিথ্যাচারের অধিক লাভের বিষয়টি বোঝার তাগিদ থেকেই এ নিবন্ধটি লিখেছি। শুরুতেই স্বীকার করছি যে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত রাখা হয়েছে, তার গুরুত্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যে নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সৌজন্য বজায় রেখে এ আলোচনা কীভাবে উত্থাপন করব, তা সত্যিই আমার জানা নেই। আমি কি একজন বাংলাদেশী নাগরিক সেজে পার্শ্ববর্তী দেশের নীতি বিশ্লেষণ করে আমার সরকারের করণীয় সম্পর্কে মত দেব? নাকি আমি এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে আমাদের জাতীয় ঐক্যের ওপর প্রতিবেশীর অভিবাসন (বা সংশোধিত নাগরিক) নীতির প্রভাব পর্যালোচনা করব? প্রথমটির ক্ষেত্রেও হাজারো বিড়ম্বনা—আমি কি নিখাদ বাংলাদেশী নাগরিক, নাকি অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশে অবাধ চলাচলের জন্য 'নো ভিসা রিকোয়ার্ড' সিল লাগিয়ে ঘুরি? নাকি মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বা ভারতে দীর্ঘকালীন অবস্থান ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষ ভিসাপ্রাপ্ত এক বাংলাদেশী নাগরিক? নাগরিকত্ব ও ধর্মের বেড়াজাল পেরিয়ে আমি যদি (চলনে-বলনে) বাঙালি পরিচয়ে এই বিশ্লেষণে রত হই, আমার খণ্ডিত পরিচিতির সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায়।

অনস্বীকার্য যে উপমহাদেশে সুদূর অতীত থেকে বহু জাতির ও ভাষার সংমিশ্রণ চলে আসছে, যা মানুষের মুক্ত চলাচলের ফলেই সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে চলেছে দেশ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া, যা গত শতাব্দীতে স্বাধীনতাকামী মানুষের জাতিসত্তাভিত্তিক আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের মুখে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির কৌশলের মিলিত ফসল। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে এই ভাঙাগড়ার খেলা নিকট অতীতকাল অবধি চলে আসছে—১৯৪৯-এর চুক্তির বলে ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরাকে ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; ১৯৬৩-তে নাঙ্গাভূমি (কথিত নাগাভূমি) রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেল; ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে; একই বছর ভারত সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল পুনর্গঠন বিধান জারি করে বৃহত্তর আসাম থেকে বিযুক্ত করে ১৯৭২ সালে মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্য গঠন করে। আরো উল্লেখ্য, সিকিমকে মূল ভারতে আত্তীকরণ করা হয় ১৯৭৫ সালে এবং বিহার থেকে ঝাড়খণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ২০০০ সালে। এসব সংযোজন ও বিভক্তিকরণের রাজনীতি-অর্থনীতি ভিন্ন পরিসরে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এখানে শুধু উল্লেখ করব যে অবাধ চলাচলের মাধ্যমে যে রাবিন্দ্রিক আত্তীকরণ ('এক দেহে হলো লীন') হওয়ার সম্ভাবনা

ছিল, তা আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ দ্রব্যবাজার ব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সব অঞ্চল ও সমাজের বিশ্ব-পুঁজির মাঝে বিলীন হওয়ার মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়নি। বরং নাগরিক নিবন্ধীকরণে বহুবিধ শ্রেণীকরণ করে 'আদি' ও 'অনাদি'র সহাবস্থানে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে এবং তা করা হয়েছে সেই সহাবস্থানে রত সংঘবদ্ধ সমাজের বিরোধী স্বার্থে।

স্থানীয় সমাজে এ-জাতীয় বিভক্তি আনা একটি পুরনো কৌশল, যা উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতে বহিঃশক্তিকে সহায়তা করেছে। একই ধরনের বিভাজন মিয়ানমারের সামরিক শাসকরা বহু বছর চালু রেখেছে। বিচিত্র নাগরিক আইনের কারণে সে দেশে আজ একই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য নাগরিক মর্যাদা পেয়েছে, আবার অন্য অনেকে অর্ধনাগরিক বা বাসিন্দা বা বহিরাগত হিসেবে অসম্মানের সঙ্গে বসবাস করছে (আমরা 'রোহিঙ্গা' ইস্যুতে সমগ্র মিয়ানমারবাসীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিই, অথচ যে আইনের কারণে তাদের সমাজ সংঘবদ্ধভাবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারছে না, তার ধারক-বাহকদের ব্যাপারে আমরা নীরব)। লক্ষণীয় যে সাধারণভাবে বিভক্তি আনাটাই লক্ষ্য, স্থান-কালভেদে নৃগোষ্ঠী, বর্ণ, ধর্ম বা অভিবাসনকাল সেই বিভক্তি আনতে প্রাধান্য পায়—ঢালাওভাবে ধর্মের লেবাস জুড়ে দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক, যেমনটি ঘটছে 'রোহিঙ্গা'দের ঘিরে। এ নিবন্ধের মূল প্রস্তাব—বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থলভূমিতে এ হাতিয়ারের বর্তমান ব্যবহারের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী।

অতীত ঘাঁটলে দেখা যায়, ভাঙাগড়ার রাজনীতি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলা ও বাংলাদেশের সমাজে। বাঙালিরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা সংকর জাতি। সংগত কারণে ভিন্ন সত্তা নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে সচেষ্ট হলেও চারপাশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করা বাঙালিদের জন্য দুরূহ থেকেছে। সর্বোচ্চসংখ্যক নৃগোষ্ঠীর মিলনস্থল এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে, যেখানে জাতি-ধর্মের বৈচিত্র্য যেমন বিভাজনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক জনপদ গড়ে ওঠায় জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার স্বাধিকার আন্দোলন আজও দৃশ্যমান। ভাঙাগড়ার অতীত কাহিনী উল্লেখের সময় ইদানীংকালের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। প্রসিডিংস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস (ভলিউম ৬৬, ২০০৫-০৬)-এ প্রকাশিত জে বি ভট্টাচার্যের 'দ্য ফার্স্ট পার্টিশন অব বেঙ্গল (১৮৭৪)' নিবন্ধটি থেকে নিম্নোক্ত তথ্য স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই ভাঙাগড়া হয়তো আরো বহুকাল চলবে:

প্রাক-ব্রিটিশ মোগল আমলের বাংলার সুবেদারির সীমানা অটুট রেখে বৃহত্তর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা (ওড়িশা) একত্রে ছিল, যার সঙ্গে 'আসাম' কথিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল (প্রাক-ঔপনিবেশিক অহম রাজ্যের সীমানা) সংযুক্ত করা হয় ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার সুবেদার দখলের পর।

১৮৬৯ সালে (ওড়িশা) দুর্ভিক্ষের পর ওড়িশা ও আসামের একটিকে বর্ধিত বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ওঠে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৪ সালে আসামকে পৃথক করা হয়, যার সুনির্দিষ্ট কারণ স্পষ্ট নয়। তবে সেই বিভাজনের সময় বাঙালি অধ্যুষিত সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া—তিনটি জেলা আসামে (নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৭২ সালের শুমারি অনুযায়ী আসাম মুখ্য কমিশনারশিপের ৪১ হাজার ৭৯৮ বর্গমাইল এলাকার ১৩ হাজার ৬২৩ বর্গমাইল উপরোক্ত তিনটি জেলার সীমানাভুক্ত ছিল। ওই কমিশনারশিপের মোট জনসংখ্যা ৪১ লাখ ৩২ হাজার ১৯ ছিল, যার মধ্যে এ তিনটি জেলার জনসংখ্যা ছিল ২৭ লাখ ২ হাজার ৩২৭। অর্থাৎ নবগঠিত আসামের (যার ভেতর নাঙ্গাল্যান্ডসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য অঙ্গরাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল) শতকরা ৬৫ ভাগ জনসাধারণ ছিল বাঙালি (ভাবতে অবাক লাগে যে আজ গোয়ালপাড়ায় 'অনাগরিক'দের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পের ছবি গণমাধ্যমে প্রচার পাচ্ছে)।

১৮৯০ সালে যখন উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের চিফ কমিশনার ছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি (১৮৯০-১৯০৫ সময়কালে ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন ঘটে বলে অনুমান করছি)।

বহুল কথিত বঙ্গভঙ্গ কার্যত দ্বিতীয় ভাঙন ছিল, যার মাধ্যমে উল্লিখিত তিনটি জেলা ও বৃহত্তর আসাম (সমগ্র উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার)-বহির্ভূত বাংলাকে ১৯০৫ সালে দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়। তখন বিহার ও ওড়িশা পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল, যা ১৯১২ সালে ভিন্ন দুটো বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে পশ্চিম বাংলা থেকে বিযুক্ত করা হয়।

অতীত কাল থেকেই নৌপথে বঙ্গের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ছিল। সে সময় বাইরে থেকে আসা জনগোষ্ঠী এখানে স্থায়ী বসতি ফেলেছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বহির্গমনের চল ছিল না। ইংরেজ শাসনামলে এ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় মৌলিক পরিবর্তন আসে, বিশেষত ১৭৫৭ সালে বাংলা অধিকৃত হওয়ার পর। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে অগ্রজে থাকায় বাংলা ভাষাভাষীরা মূল বঙ্গভূমি থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিহার ও ওড়িশায় মূলত শিক্ষা, ওকালতি, ডাক্তারি (হোমিওপ্যাথ) ও সরকারি/রেলওয়ে কর্মচারীর পেশায় বাঙালিরা নিয়োজিত ছিল বিধায় আদি বসতি স্থাপনকারীরা (সেটেলারস) সংখ্যায় নগণ্য ছিল। তাই বিহারিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেসব রাজ্যের মূলধারা সমাজ ও রাজনীতি থেকে বাঙালিদের প্রস্থান ও নিরাপদ দূরত্বে বাগানবাড়ি সংস্কৃতি/ব্যবসায় নিজেদের গুটিয়ে নেয়া বাইরের বিশ্বে দৃশ্যত হয়নি। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া যে গরিব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওড়িশায় বসত দেয়া হয়, তাদের ও তাদের বংশধরদের নাগরিকত্ব আজও বিতর্কিত এবং অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

পূর্বে দেয়া তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে আদি বাংলার বাইরে (ভারতের মধ্যে) বর্তমানের আসাম রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের বসতি তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক এবং সে বসতি গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে (সম্ভবত ইংরেজ কর্তৃক ১৮২৬ সালে অহম রাজার শাসনভার নেয়ার পর থেকে) এবং তা হয়েছে ধর্ম-নির্বিশেষে। সে-জাতীয় বসতি আসাম-সংলগ্ন মণিপুরের তিনটি জেলায়ও দেখা যায়। সেখানে বাংলা ভাষাভাষীরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও একই রাজ্যের অন্যান্য স্থানে তাদের চলাচল অভ্যন্তরীণ ল্যান্ড পারমিট প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। শতাংশের বিচারে অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালির উপস্থিতি সর্বাধিক। চৈনিক-তিব্বতীয় অতীত থাকলেও সংমিশ্রণের বিবর্তনে আজ ত্রিপুরাবাসীর ৭০ শতাংশের অধিক বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং সে রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা বাংলা। একসময় যে বাঙালিকে কোকবরকা-ভাষী ত্রিপুরার বাসিন্দারা সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তারাই আজ নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘু এবং বাঙালিদের প্রতি সংগত কারণে বৈরীভাবাপন্ন। অথচ রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিকটত্ব থাকার কারণে বাঙালি ও ত্রিপুরীর সহাবস্থানের সম্ভাবনা ছিল সর্বাধিক। আসাম-ত্রিপুরার বাইরে রয়েছে মেঘালয় রাজ্য, যেখানে খাসিয়া ও গারো নৃগোষ্ঠীর বসবাস। এই দুই নৃগোষ্ঠীর অনেকের বাস বাংলাদেশেও রয়েছে। বনজ সম্পদ ও খনিজ সমৃদ্ধ এ রাজ্যটি অজানা কারণে বাংলাদেশের অতি নিকটস্থ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যাতায়াত দুরূহ। ১৯৭১ সালের শুমারি অনুযায়ী মেঘালয়ের মোট জনসংখ্যায় বাংলা ভাষাভাষীদের অবস্থান ছিল তৃতীয়—জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ। একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে মেঘালয়ের তিন-চতুর্থাংশ জনসাধারণ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী।

উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তের বাইরে বাঙালি বিভাজনের আরো দুটো উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আছে। কথিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীদের আগমনে মিয়ানমারের বৌদ্ধ অনুসারীদের মাঝে ইসলাম ধর্ম প্রচার পায়। বাংলা ভাষাভাষীদের সেখানে উল্লেখজনক বসতি স্থাপন শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। ইংরেজদের আগমনেরও আগে বর্তমানের মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে (যা এখন রাখাইন নামে পরিচিত) বাংলা ভাষাভাষীদের আধিপত্য ছিল এবং ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা কর্তৃক আরাকান দখলের আগে পর্যন্ত সেখানকার রাজদরবারে বাংলার চর্চা বহুল কথিত। শোনা যায় যে আরাকানের স্বাধীনতাকামী মানুষ ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন সমাপ্তিকালে ভিন্ন সত্তার স্বীকৃতি চেয়েছিল, যা ব্রিটিশ বা ভারত-

পাকিস্তানের কর্তাদের অনুমোদন পায়নি। তার করুণ পরিণতিস্বরূপ আজ আমরা রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন হয়ে জাতি-বিদ্বেষ নিপীড়নের শিকার হতে দেখছি। লক্ষণীয় যে জাত ও ধর্মকে মিশিয়ে নানা জাতের নাগরিকত্ব সংজ্ঞায়নে সে দেশের নাগরিক সমাজকে বিভক্ত রাখা হয়েছে। তবে অতীতকাল থেকে আরাকান-রাখাইনে বসবাসরত, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, বাংলা ভাষাভাষী রোহিঙ্গারাই নিপীড়নের টার্গেট—উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে সে দেশে অভিবাসিত মুসলমান বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নয়।

যখন (১৯৪৭ সালে) আরাকানবাসী মিয়ানমারে অন্তর্ভুক্তিকরণ মেনে নিতে বাধ্য হয়, বাংলার মূল ভূখণ্ডে একই সময়ে আসে দেশভাগ, যার পরিণতিতে দেশান্তরের বেদনাদায়ক কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। সেই সঙ্গে বাঙালি বিভাজনে নতুন মাত্রা যোগ হয়, যা অকপটে দৃশ্যমান পশ্চিম বাংলায় এবং যার শ্রেণীবিন্যাস অধিক হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য রয়ে গেছে পূর্ব বাংলায় (বর্তমানের বাংলাদেশে)। পশ্চিমে বাঙালিরা সুচিহ্নিত (ও সুসংগঠিত) থাকায় সেখানকার রাজনীতি ও সমাজ যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি ভিটে ছাড়া মানুষের তিক্ততায় ভরা সামষ্টিক অভিজ্ঞতা পূর্ব (ও বাঙালি মুসলমান)-বিদ্বেষী সামাজিক শক্তিকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। তাই অবাক হওয়ার নয় যে এককালীন 'প্রগতিশীল' সিপিএমের অনেক নেতাকর্মীকে আজ ধর্মভিত্তিক রক্ষণশীল রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, দেশভাগকালীন অভিজ্ঞতা রঙ চড়িয়ে গণমাধ্যমে ব্যক্ত করে তরুণ মনকে বিষিয়ে দেয়ার দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়।

তুলনামূলকভাবে দেশভাগের কারণে পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তানে) আসা শরণার্থী সমসংখ্যক হলেও তাদের অধিক বৈচিত্র্য ছিল। শুধু পশ্চিম বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরাই নয়, কলকাতা ও বিহার থেকে বিপুলসংখ্যক অবাঙালি মুসলমানও এসেছিল। এই বিচিত্রতার কারণেই সম্ভবত পশ্চিমের মতো সামষ্টিক স্মৃতি (পূর্ব বাংলার) সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। অনিন্দিতা ঘোষালের দি ইনভিজিবল রিফিউজিস গবেষণা নিবন্ধে আরো জানা যায় যে উর্দু ও হিন্দি ভাষাভাষী অবাঙালি বিহারি অথবা মুহাজির শরণার্থীরা পশ্চিম পাকিস্তান (পাঞ্জাব) শাসিত পূর্ব বাংলায় (১৯৫৬ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে) অধিক সমাদৃত হয়েছিল। সামষ্টিক দুঃস্মৃতি না থাকায় যেমন পরবর্তী সময়ে ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন স্বকীয় গতিতে এগোতে পেরেছে, একইভাবে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জন অবধি পথপরিক্রমায় পুরনো খণ্ডিত স্মৃতি সামাজিক শক্তিতে রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য পশ্চিমের বেদনাবহুল স্মৃতির বিপরীতে পূর্ব বাংলায় হীন কর্মের পাপবোধ অথবা তাকে ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে ইতিহাস লোপাট করার ঘটনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আঞ্চলিক রূপ দেখে মনে হয়েছে যে সে-জাতীয় পাপবোধ দুই পর্বের দেশভাগেই ঘটেছে, যার মনন-শৃঙ্খল থেকে আজো পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষীরা বেরোতে পারেনি। জানতে ইচ্ছা করে, একই ধরনের পাপবোধ থেকে উদ্‌ভূত ধর্মান্ধতা ভারতের কোন কোন এলাকায়, বিশেষত পশ্চিমে ও উত্তরে আছে কিনা।

সার্বিক বিচারে বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে বিভাজনের মাত্রা সর্বাধিক, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির দ্বারা প্ররোচিত অথবা তাদের গৃহীত কৌশলের ফসল। এই বিভাজন যে চরম বৈরিতায় রূপ নিতে পারে, তার দৃষ্টান্ত অঢেল। বাংলাদেশে ভারত-বিরোধিতা কতখানি দেশভাগের সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে, আর কতখানি ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া, তা নিরূপণ বেশ কঠিন। তবে স্বভূমি থেকে বিতাড়িত বা চলে যাওয়া কলকাতা, বেনারস ও দিল্লির বাঙালদের সঙ্গে আলাপে বুঝেছি যে অতীতের ক্ষত আজও যন্ত্রণা দেয় এবং সে কারণে সুযোগ ঘটলেও অনেকেই পূর্বপুরুষের ভিটায় ফিরতে দ্বিধান্বিত। সেই ক্ষতের সুযোগ নিয়ে, দেশভাগকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা একপেশেভাবে তুলে ধরে আজকের তরুণ মনকে বিষিয়ে দিয়ে বিভাজন দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা অনেকের মাঝে লক্ষ করা যায়। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পথশোভায় অথবা ঋতুব্রত ব্যানার্জির রাজ্যসভায় বাঙালিবিষয়ক বক্তব্য এবং অটল বিহারি বাজপেয়ির পোর্ট্রেট উদ্বোধনে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল আহূত অনুষ্ঠানে রাজ্যসরকারের প্রতিনিধিদের যোগদান থেকে বিরত থাকা—এসবই বাঙালিকেন্দ্রিক নতুন জাগরণের ইঙ্গিত দেয়। সে জাগরণ সম্ভবত ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পশ্চিম বাংলায় বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীদের টিকে থাকার আন্দোলন হিসেবে গণ্য করাই সমীচীন। এ বিরোধের পরিণতি কোথায়

গড়াবে তা পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। তবে রাজার মিথ্যাচারের লাভ-লোকসানের বিষয়টি এ বিরোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই আলোচনা দিয়েই নিবন্ধটি শেষ করব।

অনেকের মতে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বাঙালি মনন অনেক উত্কর্ষ, যা সম্ভব হয়েছে জল-বাতাস, মাছ ও ভাতের সহজলভ্যতার কারণে। সম্ভবত একই সূত্রে গড়ে উঠেছে বহু নৃগোষ্ঠীর সম্মিলনে বাঙালি নামক আজকের সংকর জাতি। পার্সি প্রভাবিত পশ্চিমা ভারত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়েছিল বাঙালি। অনেকে তার সঙ্গে ইংরেজদের কাছে প্রথম শিকার হওয়ার নেতিবাচক দিকগুলোকেও তুলে ধরেন। যাই হোক না কেন, গুজরাটসহ উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ওঠা পুঁজি রাজনৈতিক অঙ্গনে মুখ্য চালিকা শক্তির ভূমিকা রেখেছে এবং ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে দরকষাকষি করে পূর্বাঞ্চলের দেশভাগের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ভিন্ন নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি ('যোগাযোগের রাজনীতি-অর্থনীতি')। তবে এক পাড়ে নেতাজি নিয়ে অন্ধত্ব এবং অন্য পাড়ে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাঝে উন্নয়ন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় বাঙালি ব্যর্থতার কারণ খোঁজার বা সেই পরিচিতির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়াস দেখা যায় না (অথবা তা দমিত রাখা হয়েছিল?)।

উপমহাদেশে আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যমূলক পুঁজি বিকাশের কারণে পূর্বাঞ্চলকে সবসময় সম্পদ ও শ্রম জোগানের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি (পূর্ব পাকিস্তানও) বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসেও দেখা যায় যে প্রতিনিয়ত স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা পুঁজির বৃদ্ধি একটি মাত্রার অধিক যেতে দেয়া হয়নি। সম্ভবত এই উক্তি পশ্চিম বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও আসামের জন্যও প্রযোজ্য। সে কারণেই আজ অরুণাচলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে এসি/ডিসি হাই ভোল্টেজ লাইন বসিয়ে পশ্চিমের রাজ্যগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে; উত্তর-পূর্বের সম্পদ নৌপথে পাড়ি জমাবে গুজরাটের বন্দরে এবং আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর বা মেঘালয়ের (এবং মিয়ানমারের) সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ বিনিয়োগ বা বাণিজ্য ব্যবস্থা না গড়ে সেসব রাজ্যের সম্পদ বাংলাদেশের জল-মাটি ব্যবহার করে স্থানান্তর করা হবে। এসব (বিশাল) আর্থিক অর্জন নিশ্চিত করতে চাইলে আশপাশের সব রাজ্যে সহযোগী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আবশ্যিক, যে কর্তৃত্ব রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি ছড়িয়ে সম্পদ আহরণ ও পাচারের পথকে সুগম করবে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে রাজনৈতিক মিথ্যাচারের নেতিবাচক দিক এই বিশাল লাভের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

পরিশেষে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রথমত, জাতি ও ধর্মের মিশ্রণে নাগরিকত্ব সংজ্ঞায়িত করা এক ধরনের বিভাজন নীতি, যা রাষ্ট্র কাঠামোয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা স্বল্পসংখ্যক দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষীর কর্তৃত্ব দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে। এ ফাঁদে পড়া থেকে যেমন বিরত থাকা প্রয়োজন, তেমনি অন্যকে সে ধরনের ফাঁদে ফেলা অনুচিত।

দ্বিতীয়ত, যে জনগোষ্ঠীর মাঝে বাংলা ভাষাভাষীরা বসতি নিয়েছে, তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থতা সম্ভবত বাঙালি-বৈরিতার মুখ্য কারণ। হয়তো অতি ইংরেজির বাহার দেখিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বাঙালি ঔপনিবেশিকরা (সেটলারস) মিথ্যা অহমবোধে ইংরেজদের সেবা করতে গিয়ে স্থানীয়দের বিরাগভাজন হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাইরের শক্তির কাছে সেটাই হয়ে উঠেছে অনাদি (বাঙালি) ও আদির মাঝে বিভক্তি আনার চরম হাতিয়ার। বাঙালি সত্তা জাগরণের যদি কোনো যৌক্তিকতা থাকে, সে জাগরণে অগ্রজদের অবশ্যই পার্শ্ববর্তী জাতিসত্তা ও ছোট-বড় নৃগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং পুরনো বৈরিতা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। তারও আগে প্রয়োজন নিজেদের মধ্যকার বৈরিতা নিরসন।

তৃতীয় বিষয়টি উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম দুটো ধারা লক্ষণীয়: ১. বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধীন অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও প্রতিটির মাঝে নানা শ্রেণীর বিভক্তি এনে ক্ষমতা (নির্দিষ্ট গোত্রের স্বার্থে) এক কেন্দ্রে কুক্ষিগত করা; ২. বিভিন্ন জাতিসত্তাকে স্বকীয়ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাদের সম্মিলিত কেন্দ্র গড়ে তোলা। প্রথম পথটি দ্রুত পরিবর্তন আনতে সক্ষম, তবে তা হবে

ভঙ্গুর এবং তাই পরাশক্তির কাছে এ উপমহাদেশের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্য জলাঞ্জলি হওয়ার সম্ভাবনা এ পথে অধিক। দ্বিতীয় পথটি কষ্টসাপেক্ষ, তবে টেকসই।

অবাক লাগে ভাবতে যে জাতিসত্তা ও ধর্মের টানাপড়েনে দুই পাড়ের মূলধারার বাঙালিদের একই ধরনের দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। তাদের স্থির করতে হবে যে উভয় স্বদেশের মাটিতে এবং বিশ্বপরিসরে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য নিজ নিজ ধর্ম বিসর্জন না দিয়ে বাঙালি সত্তার পুনর্জাগরণ কি আবশ্যিক (ও সম্ভব)? নাকি জাতিসত্তাকে বিপর্যস্ত করে শুধু ধর্মের আড়ালে বৃহত্তর অদৃশ্য সত্তাকে তারা লালন করবেন, যা একদিন তাদেরই বধ করবে?

[নিবন্ধের বক্তব্য লেখকের ব্যক্তি বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে ইআরজির সংশ্লিষ্টতা নেই]